ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1195- 1201
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.339

নিম্নবিত্তীয় জীবন ভাবনার আলোকে সমরেশ মজুমদারের গল্প

অনন্ত বর্মন, *গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Samaresh Majumdar is an established wiriter of the 1970s. Although born in North Bengal, he resided in Kolkata due to professional oligations. Consequently, he witnessed – on one hand – the lives of the lower classes in Kolkata, and on the other – the lives neglected, deprived, and impoverished people of North Bengal, as well as the various indigenous communities such as the Lepchas and Madeshias. He has portrayed the anguish and struggles of these lower-class people observed firsthand in various stories throughout his oeuvre. Furthermore, his stories highlight the economic hardships faced by immigrants in North Bengal, as well as the financial struggles of the lower classes who depend on the region's tea gardens, rivers, and forests for their livelihood. For instance, in the story 'Janani', just as Bindu unhesitatingly plunges into the river to grasp a floating tree trunk, her husband shows no hesitation in stripping clothes from a corpse. In the story 'Char, Shahar ebong Ekti Bekub' day laborers, domestic maids, rickshaw pullers, and hand – cart pullers – unable to find shelter for the night in Jalpaiguri city – find their soler refuge on the riverbank. Conversely, in the story 'jathor' he depicts the abject Poverty of day laborers living on the banks of the Teesta River. In 'Yuddha Kshetrey Ekjan' the marginalized farmar of North Bengal rise up in revolt against the exploitation and deprivation inflicted by landlords and feudal estate owners. In the story 'Octopus', he illustrates how certain selfish and avaricious individuals in society prey upon the lower classes to secure their own interests, intimately pushing the poor toward the brink of death. Finally, in 'Jiyono Machh', he articulates the suffering and hardships in the tea gardens. In essence, Samaresh Majumdar did not merely recount the tribulation of the lower classes; he also illuminated the paths of hope and resilience that enable them to survive.

Keywords: Lower class, farmers, day laborers, rivers, workers

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবিত্তের চর্চার ইতিহাস প্রাচীন যুগের চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যেও তা প্রবাহমান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটগল্পকার হলেও তিনি তাঁর গল্পে শুধু সমাজের মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন। নিম্নবিত্ত মানুষের কথা তুলে ধরলেও সমাজের অবহেলিত, বিত্তহীন, শ্রমজীবী, কৃষক, বস্তিবাসী মানুষেরা তাঁর গল্পে নির্বাসিত। এই আবহে আবির্ভাব ঘটে কল্লোল লেখক গোষ্ঠীর। সমরেশ মজুমদার তাঁর 'গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি' গ্রন্থে বলেছেন-

> "কল্লোল এর লেখকেরা গোকুল নাগের নেতৃত্বে সেই তথাকথিত শুদ্ধতার বেড়া ভেঙে নীচের তলার মানুষদের ওপরে তোলার চেষ্টা করলেন।"[১]

কল্লোল লেখক গোষ্ঠীর সব লেখাই যে নিম্নবিত্তের তা নয়। কিছু কিছু গল্প আছে যা আমাদের মনের গ্রন্থিগুলিকে নাড়া দেয়, যেমন– অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'দুইবার রাজা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' ইত্যাদি গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা এবং নীচের তলার মানুষদের ওপরে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই সময়ের পরর্বতী কয়েক দশক পরে আবির্ভাব ঘটে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের। তিনিও তাঁর বিভিন্ন গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন। যদিও নিম্নবর্গ ও নিম্নবিত্ত বিষয়টি এক নয়। আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে নিম্ন পেশায় নিযুক্ত অবহেলিত, নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষের জীবন নিয়ে সীমাবদ্ধ। সমরেশ মজুমদারের জন্ম উত্তরবঙ্গে হলেও কর্মসূত্রে কলকাতায় ছিলেন। ফলে তিনি তাঁর বিভিন্ন গল্পে উত্তরবঙ্গের নিম্নবিত্ত মানুষের 'খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান'-এর জন্য সংগ্রাম ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের অভিবাসীদের জীবন, চা-বাগানের মদেশিয়া শ্রমিকদের জীবন, নদী ও জঙ্গলের উপর নির্ভর করা নিম্নবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক টানাপোড়েন লেখক বিভিন্ন গল্পে উপস্থাপন করেছেন। যেমন– 'জিয়োনো মাছ', 'জননী', 'যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক জন', অক্টোপাস', 'দায়' ইত্যাদি গল্পে তিনি চা-বাগানের মদেশিয়া শ্রমিক থেকে শুরু করে তিস্তা নদীর চরে বিত্তহীন মানুষদের এবং দিনমজুরদের জীবন যন্ত্রণার পরিচয় দিয়েছেন।

সমরেশ মজুমদারের শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। এবং স্কুল জীবন কেটেছে জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর পাশে হাকিম পাড়ায়। ফলে উত্তরবঙ্গের নিম্নবিত্তের কৃষক, চা-বাগানের মদেশিয়া শ্রমিক, তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষ এবং জঙ্গলের উপর নির্ভর করা মানুষের জীবন সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই প্রত্যক্ষ দেখা নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনি তিনি বিভিন্ন গল্পে উপস্থাপন করেছ। উত্তরবঙ্গে জঙ্গলকেন্দ্রিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম দিক হল পশু শিকার। সমাজের এক শ্রেণি লোভী মানুষ সরকারের থেকে হাতির বাচ্চা শিকারের ইজারা নিয়ে কিছু দরিদ্র মানুষের উপর ভর করে হাতি শিকার করে। আর কিছু নিম্নবিত্ত মানুষ খাবার ও অর্থের বিনিময়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার কখনও কখনও হাতির পদপৃষ্ঠে প্রাণও দেয়। এই রকম একটি অসাধারণ গল্প হল 'অক্টোপাস'। এই গল্পে অভিরাম সরকারের কাছে বাচ্চা হাতি ধরার ইজারা নেয়। অভিরাম ভুটানের দুটো দরিদ্র মানুষের উপর ভর করে হাতি ধরে। লোক দুটোকে এই কাজে সাহায্য করত হীরামন আর হীরামতী নামে দুটো পোষা হাতি। এই মানুষদের সম্পর্কে অভিরামের ভাবনা–

> "খাবার তাদের কাছে স্বর্গের চেয়ে বেশি লোভনীয়। সেই খাবারের লোভ দেখিয়ে ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় সে।"[২]

খাবার ও কিছু অর্থের বিনিময়ে অভিরাম লোক দুটোকে বন্যযন্ত্র তৈরি করে। যতদিন হাতি ধরা না পরে ততদিন তাদের নুন, আলুসেদ্ধ ভাত খেতে হয়। মাছ, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন খাওয়া নিষেধ। এমনকি মদ, বিড়ি, খৈনী খাওয়া কিংবা স্ত্রীসঙ্গ করাও যাবে না। শরীরে কাদা মেখে দিন-রাত পোষা হাতি দুটোর সঙ্গে থাকতে থাকতে তাদের চামড়ায় হাতির গন্ধ চলে আসে। লোক দুটোর মধ্যে একজনের নাম মইনু অন্য জন পঁচিশ বছরের যুবক। তাদের শরীর থেকে যেমন হাতির গন্ধ বের হয় তেমনি হাতির ডাকও নকল করতে হয়। কিন্তু পঁচিশ বছরের যুবকটি জঙ্গলে লেপচা জনগোষ্ঠীর এক দোকানির যুবতী মেয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে হাতি ধরতে যায়। সেদিনেই বুনো হাতির দলনেত্রী পঁচিশ বছরের যুবকের গায়ে যৌবনের গন্ধ টের পেয়ে যুবককে মাটিতে পিসে মেরে ফেলে। আসলে সমরেশ মজুমদার এই গল্পের মধ্যদিয়ে দেখিয়েছেন সমাজের কিছু স্বার্থপর লোভী নর পিসাচদের। যারা সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের উপর ভর করে নিজেরটা গুছিয়ে নেয় এবং তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তাঁর গল্পগুলি না পড়লে বোঝা যায় না।

উত্তরবঙ্গ কৃষি প্রধান অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষক ছিলেন নিম্নবিত্তের অধিকারী। এক সময় এই অঞ্চলের জমিদার-জোতদারদের দ্বারা নিম্নবিত্তের কৃষকরা বহুদিন ধরে শোষিত হয়েছে। জমিদার-জোতদাররা শুধু বীজ ধান আর সার দিয়ে জমির তিনভাগের দুইভাগ ফসল ঘরে তুলে নিতেন। উত্তরবঙ্গের কৃষকরা জমিদার-জোতদারদের শোষন বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে আন্দোলন করেন। যা নকশাল আন্দোলন নামে পরিচিত। নকশাল আন্দোলনের পরবর্তী সময়ও প্রান্তিক কৃষকরা জমিদার-জোতদারদের দ্বারা শোষিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সমরেশ মজুমদারের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'যুদ্ধক্ষেত্রে একজন'। এই গল্পে ময়নাগুড়ির জোড়খালির জমিদার-জোতদার হরিশ রায় কৃষকদের ফলানো ফসল থেকে তিনভাগের দুইভাগ ফসল ঘরে তুলে নিতেন। জোড়খালির দরিদ্র কৃষকরা প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। এক মাত্র শিবু প্রতিবাদ করে বলে– "লাঙল যার জমি তার।"[৩] কারণ কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলায় আর জমিদার হরিশ রায় শুধু বীজ ধান ও সার দিয়ে তিনভাগের দুইভাগ ফসল নিয়ে নেয়। এদিকে কৃষকরা সারা বছর খেতে পায় না। বছরের শেষে জমিদারের কাছে হাত পাততে হয়। বউ, ছেলে-মেয়েদের জন্য ভালো পোশাক কেনার সাহস পায় না। তাই শিবু জমিদার হরিশ রায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে দুনিয়ার খেতে না পাওয়া মানুষদের এক হতে বলে। জমিদার হরিশ রায় ষড়যন্ত্র করে গাছ চুরির অপরাধে শিবুকে জেলে পাঠায়। সেই সময় দেশে ইমার্জেন্সি ঘোষণা হওয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহী কয়েদিদের মিসা ঘোষণা করে মুক্তি দেওয়া হয়। সেই রাষ্ট্রদ্রোহিতায় শিবুও মিসার আওতায় পড়ে মুক্তি পায়। শিবু জেলেই গণ মুক্তিকামী বিপ্লবীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। লেখকের ভাবনা–

> "যারা এতদিন শোষিত ছিল তারা আজ মাথা তুলছে। শোষিত কে? না যারা রক্ত দিয়ে পরিশ্রম করে। শোষক কে? না যারা সেই পরিশ্রমের ফসল পায়ে পা দিয়ে ঘরে তোলে। তার মানে হরিশ রায় শোষক, আর বড় বড় ব্যবসাদার শোষক। এই সরকার যে তাকে মিসা করেছে সেও শোষক।"[৪]

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক কৃষকরা জমিদার-জোতদারদের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গর্জে ওঠে। সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সাধারণ কৃষক। এখানে লেখকের কমিউনিস্ট ভাবাপন্নের কথা ভাবা যেতে পারে।

লেখক সমরেশ মজুমদার চার বছর বয়সে প্রথম তিস্তা নদী দেখেন। তিনি শৈশবে ঠাকুরদার সঙ্গে গয়েরকাটার চা-বাগান ছেড়ে জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর পাশে হাকিম পাড়ায় চলে আসেন। আর সেখানেই গোটা স্কুল জীবন কাটান। ফলে তিস্তা নদীর চর তাঁর প্রিয় জায়গা হয়ে ওঠে। এই চরে এসে বন্ধুদের সঙ্গে কত আড্ডা দিয়েছেন। একা একা বসে কত বই পড়েছেন। বন্যায় তিস্তা যখন ভয়ংকর রূপ ধারণ করে তখন চরের মানুষসহ ঘর-বাড়িগুলো খড়কুটোর মতো ভেসে নিয়ে যায়। আবার কখনও ভেসে আসা গাছেরগুঁড়ি ধরতে নদীর চরের মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। লেখক ১৯৬৮ সালের বন্যায় দেখেছেন কীভাবে জলপাইগুড়ি শহরকে গ্রাস করেছিল। সমরেশ মজুমদার তাঁর 'গীতবিতান ছুঁয়ে' গ্রন্থে জানিয়েছেন–

> "জল ভেঙে ভেঙে যখন তিস্তা ব্রিজে উঠে এলাম ব্রিজ অটুট আছে। কিন্তু জলপাইগুড়ি শহরের দিকে যে বাঁধ ছিল তা ভেঙে উড়ে গেছে। নিচে তিস্তার ঢেউগুলো ফুঁসছে। পাহাড়ের কোনও লেক বৃষ্টির জলের চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে গিয়ে নিচে নেমে এসেছিল তীব্র গতিতে। বাঁধ উড়িয়ে দিয়েছিল এক লহমায় হড়পা বান কথাটা তখনও চালু হয়নি। কিন্তু সেই বিপুল জলরাশি নিমেষে শহরটাকে তছনছ করে দিয়েছিল মধ্যরাত্রে।"[৫]

সেই ভেসে আসা জলে কত মৃত মানুষের লাশ ছড়িয়ে পড়ে ছিল। কিছু মানুষ সেই মৃত মানুষের কাপড়ের লোভ সামলাতে না পেরে খুলে নিয়েছে। আসলে তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষরা নদীর সঙ্গে লড়াই করে

বেঁচে থাকে। তাই তিস্তার হাত থেকে বাঁচতে তিস্তাবুড়ি নামে পূজা করে। নদীর চরে বসবাসকারী মানুষের কাছে তিস্তা কখনও দেবতা আবার কখনও আত্মীয় হয়ে ওঠে। তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা সমরেশ মজুমদার বিভিন্ন গল্পে উপস্থাপন করেছেন। 'জননী' গল্পে তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষের কাছে নদী জননী হয়ে ওঠে। এই গল্পে বিন্দু নদীর মাঝখান দিয়ে ভেসে আসা একটা কাঠেরগুঁড়ি দেখে বুড়িতিস্তাকে মানত করে– "পাঁচ পয়সার বাতাসা মা, ও মাগো বুড়ি, মানত রইল, ঠেলে দাও এদিকে, ঠেলে দাও।"[৬] তিস্তার বন্যায় যেমন নিমিষেই ঘর-বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি বন্যায় গাছেরগুঁড়ি ধরার জন্য আবার মানতও করে। আসলে নদীর চরে বসবাসকারী মানুষরা নদীর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমরা বিন্দুর মধ্য দিয়ে লক্ষ করি। বিন্দু এই গাছেরগুঁড়ি ধরতে পারলে যেমন তার জ্বালানির অভাব মিটবে তেমনি বিক্রি করলে কুড়ি টাকা পাবে। এই কুড়ি টাকা সে কোনও মতে হাতছাড়া করতে চায় না। বিন্দু মস্ত বড় গাছেরগুঁড়িটাকে ধরতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাছেরগুঁড়িটাকে চরে টেনে এনে দেখে সঙ্গে দুটো লাশও ভেসে এসেছে। লাশ দুটোকে দেখে তার বর-বউ মনে হয়। বিন্দু মড়া দুটোকে কাশ ফুলের জঙ্গলে টেনে এনে বাড়িতে গিয়ে স্বামীকে ডেকে বলে–

> "হেই উঠ উঠ উঠ না কেনে, আঃ মরণ আমার। একবার নদীর ধারে চল কেন, বিরাট গাছ ধরেছি। এক কুড়ি টাকার গাছ। আর জোড়া বরবউ! মড়া।"[৭]

বিন্দু একটা দা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে নদীর দিকে দৌড়ে এসে গাছেরগুঁড়িটাকে দেখতে না পেয়ে তার মাথা ঘুরে যায়। জলের স্রোতে গুঁড়িটা ভেসে গেছে। বিন্দুর স্বামী মড়া দুটোর চারদিকে ঘুরে পুরুষটার জামা কাপড় খুলে নেয়। বউটার পড়নে নতুন শাড়ি দেখে লোভ সামলাতে না পেরে টান মেরে বিন্দুকে বলে– "নে ধর, নতুন শাড়ি। হাই বাপ, মা কালীর মতো দেখায় যে তোরে। নে-নে পরে নে ক্যানে।"[৮] বিন্দু নতুন শাড়ি পেয়ে গাছের গুঁড়িটার দুঃখ ভুলে যায়। আসলে তিস্তার বন্যা উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন সংগ্রাম, তাদের বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লেখক বিন্দু ও তার স্বামীর মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন। কতটা অভাবে পরলে মানুষ মৃত মানুষের কাপড় খুলে নিতে বাধ্য হয় বিন্দুর স্বামী ও বিন্দু তার পরিচায়ক।

অন্যদিকে তিস্তার ভয়ংকর বন্যার ছোবল জলপাইগুড়ি শহরকে ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। সেই সময় বাঁধ দিয়ে নদীর কোমর ভেঙে দেয়। ফলে নদীতে চর সৃষ্টি হয়। নদী এতটাই দুর্বল হয়ে যায় যে, নিজের সৃষ্টি করা চরও ডিঙাতে পারে না। সেই চরই হয়ে ওঠে আশ্রয়হীনদের আশ্রয়স্থল। জলপাইগুড়ি শহরের দিনমজুর, ঠিকেঝি, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালাদের জীবনে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানে চরম সংকট দেখা দেয়। অন্ন-বস্ত্র মিললেও তাদের বাসস্থান মেলেনি। শেষে তিস্তা নদীর চরেই তাদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। এদের জীবন নিয়ে সমরেশ মজুমদারের একটি গল্প হল 'চর, শহর এবং একটি বেকুব'। এই গল্পে জলপাইগুড়ি শহরে এক ভিনদেশী দিনমজুর সারাদিন কাজ করে রাতে শহরের ফুটপাতে ঝুপড়িতে থাকে। শহরের নগরপালের করা নির্দেশ– "শুধু দিন মজুরি করে যাও, তা বেশ, কিন্তু রাত্তির বেলায় ফুটপাতে থাকা যাবে না।"[৯] এক দিকে নগরপালের শাসানি অন্যদিকে পুলিশের লাঠির ঘা খেয়ে তিনদিন হাজতে থেকে মুক্তি পায়। ভিনদেশী দিনমজুর সারাদিন কাজ করতে পারবে কিন্তু ফুটপাতে থাকতে পারবে না। তাদের ভাড়া বাড়িতে থাকতে নির্দেশ দেয়। একজন দিনমজুরের পক্ষে ভাড়া বাড়িতে থাকার সামর্থ্য নেই। তাছাড়া তাদের কে ভাড়া দেবে? শেষ পর্যন্ত ভিনদেশী দিনমজুর তিস্তা নদীর চরে বাঁশের দরমা দিয়ে ঘর তৈরি করে মাথা গোজার জায়গা করে নেয়। এই খবর শহরের ফুটপাতে থাকা আশ্রয়হীনদের কানে পৌঁছে যায়। ফলে চরে ধীরে ধীরে ঠিকে ঝি, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালাসহ মোট পনেরো ঘর বাসিন্দা হয়ে যায়। এদিকে শহরে চুরি চামারি বেড়ে যাওয়ায় চরে পুলিশ এসে তাদেরকে শাসিয়ে যায়–

> "এই চরে লোক বাড়ার পর থেকে শহরে চুরিচামারি বেড়ে গেছে। লোকে বলছে চরের লোকই রাতে শহরে চুরি করতে যায়। এটা বেআইনি বসতি অতএব উঠে যাও তোমরা। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না।"[১০]

নির্জন নদীর চরেও নিম্নবিত্ত মানুষদের শান্তিতে থাকার অধিকার নেই। প্রতি মুহূর্তে ভয় এই বুঝি তাদের ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। অন্যদিকে থানার দারগাবাবুর শাসানি। নদীর চরে প্রথমে আসে ভিনদেশী দিনমজুর, দ্বিতীয় ঘর গাজাখোর ও তার স্ত্রী ঠিকেঝি, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা মিলে একটা সুন্দর পাড়া তৈরি হয়। লেখক সমরেশ মজুমদার হত দরিদ্র মানুষের মনেও প্রেমের জোয়ার বয়ে আনেন ভিনদেশী দিনমজুর ও ঠিকেঝির বোনের মধ্য দিয়ে। তারা দু'জনে সংসার পাতে। কিছু দিনের মধ্যে দিনমজুর তার বউয়ের পেটে বাচ্চা আসার খবর শুনে আনন্দে পুলকিত হয়। দিনমজুরের বউ বলে–

> "হেসো না। এখন তোয়াজ করবে কি দিয়ে। ক'টা টাকা কামাও। আমার এখন ঝাল মাংস খেতে ইচ্ছে করছে, খাওয়াও দেখি।"[১১]

কিন্তু দিনমজুর লোকটি সারাদিন দিনমজুরি করে বড়জোর দু'বেলা আলুসেদ্ধ ভাত জোটাতে পারে। কিন্তু তিনি বউয়ের ভালো মন্দ খাওয়ার স্বাদ মেটাবেন কীভাবে? তাই তার বউ শহরের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করতে যায়। সেই বাড়ির বাবুদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসে ইলিশ মাছ। এই ব্যাপারটি দিনমজুর লোকটি সহ্য করতে পারে না। কারণ সে দরিদ্র হতে পারে কিন্তু ভিখারি নয়। দিনমজুর লোকটি তার বউকে শহরে বাসন মাজার কাজ করতে নিষেধ করে বলে– "ফের যদি শহরে ঢুকিস তাহলে গলা টিপে মারব। সেদ্ধভাতে সুখ হবে কি না বল।"[১২] কারণ এই শহরের মানুষেই একদিন তাকে মাথা গোজার ঠাই দেয়নি। বর্ষায় সাত দিন অনবরত বৃষ্টির ফলে নদী ফুলে-ফেঁপে ওঠে জলপাইগুড়ি শহরকে হ্রদে পরিনত করে। ফলে গোটা জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ বাঁধে এসে জরো হয়। চরের মানুষ নৌকায় করে পালিয়ে আসে বাঁধের পারে। কিন্তু দিনমজুর লোকটি তার বউকে নিয়ে চর ছেড়ে পালিয়ে আসেনি। আসলে সমরেশ মজুমদার নদীর চরে বসবাসকারী দিনমজুরদের সংকটময় পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন।

'জঠর' গল্পে সমরেশ মজুমদার নদীর চরে বসবাসকারী দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের চরম দারিদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পে পৌঢ় ও পৌঢ়ার দশটি সন্তানকে দু'বেলা ভাতও দিতে পারে না। মুড়ি খেয়ে আধপেটা থেকে দিন অতিবাহিত করে। পৌঢ়র প্রতিদিন কাজ জোটে না। যেদিন কাজ জোটে সেদিন চরে উনুন জ্বলে। যেদিন কাজ জোটে না সেদিন চরে উনুনও জ্বলে না। পৌঢ়ার শরীরে জ্বর থাকায় কয়েকদিন কাজে যেতে পারেনি। পৌঢ় তার বোবা ছেলেকে নিয়ে ভবানীর মাঠে কাজের খোঁজে আসে। আর সেখানে গাছতলায় দিনমজুরা শীর্ণ শরীর নিয়ে কাজের খোঁজে বসে আছে। তাদের বুকের খাঁচার হারগুলো গোনা যায়। সিল্কের পাঞ্জাবি পড়া এক লোক কাজের লোক খুঁজতে ভবানীর মাঠে আসে। তার জঙ্গলে মুরগী ও ছাগল ছানাদের দেখাশোনা করার জন্য একজন কাজের লোকের প্রয়োজন। লোকটি পৌঢ়র ছেলেকে কাজ দিতে চায়। কারণ পৌঢ়কে কাজে নিলে একসের চালের ভাত খাওয়াতে হবে। পৌঢ় ও পৌঢ়া বাধ্য হয়ে বোবা ছেলেকে পাঠায় দু'বেলা ভাত ও পনেরো টাকার আশায়। পৌঢ়া তার ছেলেকে মুড়ি বাতাসা খাইয়ে সাজিয়ে জঙ্গলে মুরগি ও ছাগলছানা পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়। বিদায় মুহূর্তে বাবা-মাসহ নয়টি কন্যা সন্তান ভাবছে ছেলেটি ভাতের প্রাসাদে যাচ্ছে। কেউ বলে দাদা ডিম আনবে, কেউ বলে দাদা দুধ আনবে। তাদের কত আশা, কত দিন তারা দুধ ডিম খায়নি। লোকটি ছেলেটিকে তার জঙ্গলে এনে বলে–

> "এই হল আমার জায়গা। সব দেখে নে। ছাগল দেখবি, মুরগী দেখবি। কারও যদি অযত্ন হয় তো পেটে পা ঢুকিয়ে দেব শালা। পনের টাকা দিতে হবে, কাজ যদি সেরকম না হয় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব।"[১৩]

লোকটির শরীরে জ্বর তাই সে রাতে ভাত খাবে না বলে ছেলেটিকেও না খেয়ে পাহারা দিতে হয়। ছেলেটি তিনদিন ধরে ভাত খায়নি।

> "দু'মুঠো মুড়ি ছাড়া সে কিছুই খায়নি। তার মা বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে ভাত নিয়ে আসত থালা বেঁধে। বাপ কাজ পেলে চরে উনুন জ্বলত। তারা দশ ভাই-বোন সেই ভাত পেটে পুরে রাত্রে ঘুমত। তিনদিন মা কাজে যায়নি, বাবাও কাজ পায়নি। তাই ভাতও নেই পেটে।"[১৪]

আসলে সমরেশ মজুমদার এই গল্পের মধ্যদিয়ে সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন।

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের মদেশিয়া শ্রমিকদের নিম্নবিত্তীয় জীবন যন্ত্রণার পরিচয় পাওয়া যায় 'জিয়ানো মাছ' গল্পে। এই গল্পে বংশী চা-ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। মেয়েরা ফ্যাক্টরি থেকে চা চুরি করলে কেউ ধরতে পারে না। কিন্তু বংশী যেদিন চুরি করে সেদিনেই ধরা পরে যায়। ফলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। আসলে বংশীকে লোভ দেখায় সোনিরাম মুদি– "ওরে বংশী, শুনলাম গুদামে কাজ করিস, নিয়ে আয় চা মুঠি কতক দশ টাকা কিলো দেব।"[১৫] এই লোভে পড়ে বংশীর চাকরি চলে যায়। ঐ টাকা দিয়ে হয়তো কয়েকটি হাড়িয়ার বোতল কিনতে পারত। কিন্তু শেষে চাকরি মেলে চা-বাগানের হাসপাতালে। চা-বাগানের মদেশিয়া শ্রমিকদের মাংসের অভাব মেটাত জঙ্গলের পাখি। বংশী সিরিনের বউকে জঙ্গল থেকে তিনটি চিড়িয়া মেরে দিয়ে মাংস খাওয়ার স্বাদ মেটাত। 'বড় পাপ হে' গল্পে নামবিহীন নায়কের নিম্নবিত্তীয় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের নায়ক নোনা রায়ের খুটিমারী জঙ্গলের পাশে কলাবাগান পাহারা দেয় বছরে একশো টাকার বিনিময়ে। নোনা রায় ধান কেটে নিয়ে যায় কিন্তু একমুঠি ধানও দিয়ে যায় না। সমাজের কিছু মানুষ তাদের শোষণ করে এবং এক ঘরে করে রাখে। নোনা রায় সেই সমাজের প্রতিনিধি। ফলে গল্পের নায়ককে আংরাভাসা নদী থেকে মাছ এবং জঙ্গলের পাখি খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। 'দায়' গল্পে লেখক জয়দেব চরিত্রের মধ্যদিয়ে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন দেখিয়েছেন। জয়দেবের মা গোলাপবালার ইচ্ছা ছিল গঙ্গায় শরীর রাখার। হাউলি গ্রামের একমাত্র শ্রীধর ঘোষের বাবার কালীঘাটের শ্মশানে যাওয়ার ভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু গোলাপবালা মানুষের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে সেই ইচ্ছা মেটাবে কীভাবে? একদিন ভোরে বাসন মাজার কাজে যাওয়ার সময় গোলাপবালাকে চৌধুরীবাবুর লরি চাপা দিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। স্থানীয় ডাক্তারের নির্দেশে কলকাতার বেলেঘাটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও জয়দেব তার মাকে বাঁচাতে পারেনি। হাউলি থানা থেকে কোন অ্যাকসিডেন্টের খবর না আসায় মাডার্রের সন্দেহে জয়দেবকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। ফলে গোলাপবালাকে ন'দিন লাশকাটা ঘরে শুয়ে থাকতে হয়। কলকাতা আসার পর জয়দেবের মনে হয় চারিদিকে শুধু শকুনের মেলা, সবাই যেন হা করে আছে। জয়দেব বলে– "না, আমার টাকা অত সস্তা নয়। গরিব মানুষ দেখেও তোমাদের মায়া হয় না।"[১৬] জয়দেবের পকেটে যা টাকা ছিল তা হাসপাতালের বাবুকে, মর্গে, তার মাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে গাড়ির ড্রাইভারকে দিতেই শেষ হয়ে যায়। শ্মশানে দাহ করার জন্য কোন টাকা নেই। কিন্তু শ্মশান কর্মীরা টাকা ছাড়া তার মাকে দাহ করবে না। জয়দেব শেষে বাধ্য হয়ে তার হাতের রুপার তাবিজ এবং গালিগালাজ, কিল ঘুষির পরিবর্তে তার মায়ের দাহকার্য করে।

সমরেশ মজুমদার সত্তর দশকের পরবর্তী সময়ের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক ছিলেন। তিনি তাঁর গল্পে শুধু নিম্নবিত্ত মানুষের কথাই বলেননি, তাদের বেঁচে থাকার আশা ও ভরসার পথও দেখিয়েছেন। তাঁর গল্পে সমাজের প্রান্তিক কৃষক, দিনমজুর, শ্রমিক ও বৃত্তিহীন মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য লড়াইয়ের পরিচয়

পাওয়া যায়। তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষদের একদিকে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন অন্যদিকে নদীর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করা যায়। আসলে তিনি মানুষকে নিয়ে লিখতে ভালোবাসতেন। ফলে মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথাই তাঁর গল্পে বার বার ওঠে এসেছে।

তথ্যসূত্র:

১. মজুমদার, সমরেশ। গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি। সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৬৭।
২. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ১। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩৬৬।
৩. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ২। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ২২৭।
৪. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ২। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ২৩৬।
৫. মজুমদার, সমরেশ। গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি ২। সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৪০।
৬. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ১। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৯৩।
৭. তদেব, পৃ. ৯৫।
৮. তদেব, পৃ. ৯৬।
৯. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ২। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ২৪৭।
১০. তদেব, পৃ. ৪৮।
১১. তদেব, পৃ. ৫৪।
১২. তদেব, পৃ. ২৫৫।
১৩. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ২। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৩১০।
১৪. তদেব, পৃ. ৩১১।
১৫. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ১। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩৩৭।
১৬. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ২। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৬২।